উন্নয়নের ফিরিওয়ালা

তুষার চক্রবর্তী

উন্নয়ন নিয়ে এখন দেশ জুড়ে আলাপ আলোচনা জমে উঠেছে। শোনা যাচ্ছে, বিদেশ থেকে উন্নয়নের জন্য অর্থের স্রোত নাকি ভারতবর্ষের দিকে ধেয়ে আসছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে ভারতের উন্নয়ন নিয়ে ভারতবাসীরা নিজেরা যতখানি ভাবিত, উন্নতদেশের ধনীরা বুঝি তার চেয়েও বেশি চিন্তাভাবনা করছেন। দাতা-কর্ণদের উদ্দেশ্য-বিধেয় টেনে বার করা আমার কর্ম নয়। আমি শুধু সাম্প্রতিক হাওয়া-বদলগুলির ইতিহাস আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। বলতে চাই এই সাম্প্রতিক হাওয়াটির আনুষঙ্গিক সমস্যার কথা। আর স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার দু একটা নিদর্শন একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

কিছুদিন আগে হাওয়া বইছিল অন্যরকম। তখন আমরা জাতীয় সংহতি নিয়ে বড় বেশি মেতে উঠেছিলাম। জাতীয় সংহতি বিপন্ন হওয়া মানে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়া -- এই ফর্মূলা আমরা সেদিন বিশ্বাস করেছি। রাজনীতি ছাপিয়ে শিল্প-সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যমগুলি সেদিন একজাতি-একপ্রাণ-একতার তত্ত্বে নিনাদিত হত প্রতিনিয়ত।

তারপর ঘটল পালাবদল। অপারেশন নীল তারা দেশের সংহতিকে বাড়ানোর বদলে হানল দেশের চূড়ায়। অহিংসার বেদিতে অতঃপর ভাগোয়া ঝান্ডা উড়িয়ে শক্তিপূজার আয়োজন হল -- ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জটিল অঙ্কে। শোনা গেল, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা বিপন্ন, নির্যাতিত - চীনের পান্ডা কিংবা সুন্দরবনের বাঘের মতোই নাকি নিশ্চত বিলুপ্তির পথে। তাদের রক্ষা করাটাই তখন জাতীয় কর্তব্যে পরিণত হল। বিশেষ ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে হিংস্র, চরমপন্থী এবং 'অতিমাত্রায় প্রজননশীল' বলে চিহ্নিত করে তাদের সন্ত্রস্ত করে রাখাটাই ক্ষমতাসীন শাসকদল কর্তব্য বিবেচনা করলেন। দেশের 'শিক্ষিত' মানুষ আর গণমাধ্যমের একটা বড় অংশ তাদের সুরে সুর মেলাল। এই মনোভাব চাগিয়ে রাখার জন্য প্রথমে পোখরাণ-২, এবং তা অচিরাৎ বুমেরাং-এ পরিণত হওয়ায় দেশের এক শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলে একটি পরিকল্পিত গণহত্যার গণপরীক্ষার আয়োজন করা হল। সে বড় সুখের সময়, সে বড় শান্তির সময়!

কিন্তু প্রায় ছ-হাজার বছরের পুরোনো ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মেরুদন্ড ক্ষুধায়, অপুষ্টিতে ও চোখরাঙানিতে যতই বেঁকে যাক, কোথাও যেন আত্মিক কোনো দৈবশক্তি ও শ্রেয়োত্বের বোধ দুর্মর হয়ে থেকেই গেছে। তাই পরমাণুশক্তির দম্ভ আর সন্ত্রাসের ভাইরাসকে অতিক্রম করে জনাদেশ নির্বাচনের সুযোগে, কোনো পূর্বঘোষণা ছাড়াই, নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়াল।

ফল, আবার রাজনীতির পালাবদল। চিত্রনাট্যে পরিবর্তন। ধর্মনিরপেক্ষতা আর সেকুলারিজ্‌মের নেশা ততদিনে ফিকে হয়ে গেছে। তাতে তেমন মৌতাত আর জমে না। সংহতি আর শক্তিতত্ত্বের ঝাঁঝও তলানিতে এসে ঠেকেছে। তাই দেশবাসীকে জাগাবার জন্যে আজ চাই নতুন, উন্নততর স্লোগান। উন্নয়নের স্লোগান।

স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া বড় কঠিন কাজ। অনেক সময় তাকে সত্যের বিরুদ্ধে যাওয়া বলে ভুল হয়। তবে সত্য কঠিন হলেও তাকে ভালোবাসবার প্রণোদন দিয়ে গেছেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। 'সে কখনো করে না বঞ্চনা।' এই গুরুদেব বেঁচে থাকলে আজ নির্ঘাত উত্তর-আধুনিকদের দলে ভিড়তেন। পশ্চিমী আধুনিকতার রাজনৈতিক মাত্রায় তাঁর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। জাতীয়তাবাদকে তাই একেবারেই মেনে নিতে পারেননি। জাতীয় আন্দোলনের প্রজ্বলন্ত পর্বে *Nationalism* নামের চটি বইটিতে জাতীয়তাবাদকে তুলোধোনা করে তিনি ঘোষণা করলেন,

ভারতবর্ষের সমাজ রাজনীতির তোয়াক্কা করে না -- তা সমাজপ্রধান। ন্যাশনালিজ্‌ম ইউরোপের ফেরিওয়ালাদের আমদানি করা ঝকমকে এক পসরা মাত্র।

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন, তাহলে ভারততীর্থ, বঙ্গমাতা, সোনার বাংলা প্রভৃতি অহিফেনের কারবার তিনি ফাঁদলেন কেন ? কোথাও কি দ্বিচারিতা আছে এর মধ্যে ? এর একটা উত্তর এইভাবে দেওয়া হয়ে থাকে যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভৌগোলিক বা ভূমিগত নয় -- ভাবগত। দেশ ছিল তাঁর স্মৃতিতে, মননে, সংস্কৃতি আর মানবিকতার সংমিশ্রণে। এ একটা রীতিমতো গোলমেলে পদার্থ, পদার্থবিদ রসায়নবিদের অধ্যয়নের অতীত। এই শ্মশ্রুশোভিত প্রশান্ত মুখচ্ছবির মানুষটি সহজপাচ্য বা সহজবোধ্য নন।

কিন্তু এসব কথা থাক। এখন দেশ জুড়ে বইছে উন্নয়নের উতল হাওয়া। মনে হচ্ছে, এখনই উন্নয়ন না হলে ভারতবর্ষ যে কোনো দিন ভারত মহাসাগরে তলিয়ে যাবে। ব্যাপারটা কী ?

শাস্ত্রকাররা বলতেন, অর্থই অনর্থের মূল। আজ সাম্যবাদীরা (প্রাক্তন ?) বলছেন, অর্থই মোক্ষ। কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছে সব। আজ যখন কেউ আমাদের গ্রাম, চাষবাস আর ভারতীয় সমাজের অন্যান্য স্থায়ী চিহ্নগুলির কথা বলেন, মনে হয় যে ক্ষুদ্র স্বার্থ, কূপমন্ডূকতা কিংবা দলীয় প্ররোচনায় এসব বুলি বলছেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মৌলিক চেতনাকে একটু পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার জন্য আমি এই উন্নয়নের হাওয়ায় হিন্দ্‌-স্বরাজ এবং গান্ধিজীর কথা তুলতে চাই।

কার্ল মার্কসের ভাবনার আকরগ্রন্থ যেমন কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো, গান্ধিজীর তেমনি 'হিন্দ্‌ স্বরাজ'। ভারতের স্বতন্ত্র নীতিগত অবস্থান আর দুর্বলতা, দুই-ই এখানে ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। ফলে বৃটিশরা অবিলম্বে বইটি বাজেয়াপ্ত করে এবং ১৯১০ সালে এটিকে রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষণা করে। আমি নিশ্চিত যে যাঁরা উঠতে বসতে গান্ধিজীর নামে পুজো দেন, তাঁদের অধিকাংশই এই ইতিহাসটি জানেন না, বইটিও পড়েননি। তাই ভারতের 'উন্নয়নের' জন্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গুটিকতক ইউরোপীয় ফর্মূলা ফিরি করে চলেন। এঁদের ধান্দাবাজির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে গান্ধিজীর বইটি বর্মের মতো কাজ করে।

স্বরাজ, উন্নয়ন, উত্তরণ, ঐতিহ্য -- এইসব নিয়ে গান্ধিজী ঐ বইতে কী কী বলেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিয়েই এ লেখা শেষ করা যেত। কিন্তু আমি সচেতনভাবেই তেমনটি করছি না। এ লেখার পাঠক হয়তো দু'টাকা দিয়ে বইটি কিনে পড়লেও পড়তে পারেন, এই আমার আশা।

ভারতের কৃষিজীবীরা আজ এক দেশজোড়া পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের মতো সচ্ছল, কেতাব-শিক্ষিত, ব্যবসায়ী, শিল্পী, বিজ্ঞানীরা ভারতবর্ষের বিশাল জনসমুদ্রে আজও বিন্দুবৎ। আর সেই আমরা গ্রাম ভেঙে শহর বানাতে চাইছি ; কৃষিজীবীরা রূঢ় হাতে আমাদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেবে, সেই ঝুঁকি থেকেই যায়।

গান্ধি সেইখানেই প্রসঙ্গিক। উকিল, জমিদার আর তাঁবেদারদের তৈরি কংগ্রেসকে তিনিই প্রথম বোঝান যে দরকার হলে ঐ কৃষিজীবীরা কারো সাহায্য ছাড়াই স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেবে। সেই দেখার চোখ তাঁর ছিল। এই কৃষিজীবীরাই হয়ে উঠেছিল তাঁর তুরুপের তাস। সেই কারণেই কি স্বাধীন ভারতে তাঁর অস্তিত্ব বিপজ্জনক হয়ে পড়েছিল ? গান্ধি-হত্যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তো রচিত হয় নি। হয়তো সেটা স্বাভাবিক ছিল। যিনি শুধু স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল সৃষ্টিই নয়, প্রয়োজনে দাবানলকে ফুৎকারে নিবিয়ে দেবার ক্ষমতাও রাখেন, কোনো শাসকবর্গই তাঁকে নিয়ে খুব স্বস্তিতে থাকতে পারেন না।

মনে রাখতে হবে, পরিবর্তন যতই হোক, আজও ভারতবর্ষ শিক্ষিত এবং সম্পদবানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সচ্ছলতা ও আকাঙ্ক্ষার বিস্তার যদিও হয়েছে, তবু সংখ্যায় আর অনুপাতে এই সুবিধাভোগীরা আজও সমুদ্রে বিন্দুবৎ। দেশকে যারা শাসন করছে বলে মনে করছে, দেশ কি সত্যিই তাদের দখলে আছে ? দেশকে ইউরোপ-আমেরিকা, নিদেন পক্ষে হংকং-সিঙ্গাপুর বানিয়ে দেবার স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁরা নিজেদের অপূর্ণ কামনারই শিকার মাত্র। ভারতবর্ষের রাজা-নবাব থেকে শুরু করে ক্ষমতার শীর্ষে যারাই বসেছে, তাদের অনেকেই এইরকম কামনারই এইরকম স্বপ্ন দেখেছে, হীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়েছে। ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কোনও দিনই এই ধরনের হীন অনুকরণে পুরোপুরি সামিল হয়নি। হয়নি বলেই ভারতবর্ষ নামক সভ্যতাটি টিকে আছে, টিকে থাকবে।

উন্নয়নের ফিরিওয়ালাদের এ কথাটা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবার উপযুক্ত সময় এখন।

লেখক ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব কেমিক্যাল বায়োলজি (কলকাতা)-র মলিকিউলার বায়োলজিস্ট